R-4

Udyog, September, 2004

বেঙ্গল এমটা কোল মাইনস্ লিমিটেড
মানুষের জীবন ও জীবিকা

একটি উদ্যোগ প্রতিবেদন

আসানসোল শিল্পাঞ্চলের একটা খুব পরিচিত দৃশ্য - সাইকেলে বা ভ্যাগে কয়লার বড় বড় বস্তা চাপিয়ে টেনে-ঠেলে নিয়ে যাওয়া। বিক্রির উদ্দেশ্যে। মনে হয় মানুষগুলো কোন এক প্রেতপুরী থেকে কয়লার ধুলো ঝেড়ে চলতে শুরু করেছে। প্রায় তিন-চার কুইন্টাল কয়লাকে ঠেলে নিয়ে আসে কম বেশী ২৫ থেকে ৩৫ কিমি রাস্তা। তারপর বাড়ি বাড়ি বিক্রি ক'রে নিজের গ্রামে ফেরে।

আজকের এই শিল্প সভ্যতার যুগে বহুজাতিক কোম্পানীদের তৈরি ভারী মাটি কাটার যন্ত্রের (চলতি নাম HEMM - হেভি আর্থ মুভিং মেশিন) ব্যবহার শুরু হয়ে গেছে সর্বত্র। যন্ত্র পৃথিবীর বুক খাবলে দ্রুত কয়লা তুলছে। কোন কোন খোলামুখ খনি থেকে দিনে প্রায় ৮ হাজার থেকে ১০ হাজার টন। বড় বড় ডাম্পারে করে কয়লা পরিবহন হচ্ছে। প্রশ্ন হচ্ছে তারপরেও এভাবে প্রাণান্তকর পরিশ্রম করে সাইকেলে বা ভ্যানে এতটা পথ কয়লা বহন করে আনতে হয় কেন? তা কি জ্বালানী তেল বাঁচাবার জন্য? পরিবেশের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সহবস্থানের জন্য? না কি বর্তমানের প্রচুর পরিমাণ অব্যবহৃত শ্রমশক্তির কথা মনে রেখে নিবিড় শ্রমের উৎপাদন ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখার জন্য নাকি এ আসলে প্রান্তিক মানুষের বেঁচে থাকার লড়াই। এর উত্তর খুঁজতে গিয়ে আমরা পৌঁছে যাই বেঙ্গল এমটা কোল মাইনস্ লিমিটেডের তারা খোলামুখ খনিতে। এই প্রতিবেদনে আমরা বোঝার চেষ্টা করবো এই প্রচুর কয়লা সম্পদে সমৃদ্ধ অঞ্চলে এই কয়লা খনিকে কেন্দ্র করে বসবাসকারী মানুষ ও শ্রমিকদের অবস্থা। এই প্রাকৃতিক সম্পদ এই মানুষদের জীবনকে কতটা সমৃদ্ধ করছে।

আসানসোল মহকুমার উত্তর - পশ্চিম অংশে জামুড়িয়া ও বারাবণী ব্লকে অবস্থিত তারা (ইষ্ট) ও তারা ওয়েষ্ট ব্লক। আসানসোল রেলওয়ে স্টেশন থেকে রাস্তা ধরে ২০ কিমি দূরে। এখানে ছিল কোম্পানীর আমলের ভূগর্ভস্থ কয়লাখনি। ইনক্লাইন পদ্ধতিতে মাটির নীচ থেকেই কয়লা উত্তোলন হত। কয়লা শিল্প জাতীয় করণের পরে ই সি এল এখানে ১৯৯২ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত কয়লা উত্তোলন করে। তারপর এই পরিত্যক্ত খনি থেকে স্থানীয় মানুষ "বেআইনী ভাবে" কয়লা তুলছিল। শুধুমাত্র শাবল গাঁইতি ও ঝোড়ার সাহায্যে। এই কয়লা সাইকেলে চাপিয়ে বা গরুর গাড়িতে করে চলে আসত জ্বালানী কয়লা তৈরির ডিপোতে। এখান থেকে অল্প পরিমাণ অনুমোদিত (লাইসেন্সড্) কয়লার সাথে সমস্ত কয়লাই বিক্রি হয় কলকাতা সহ কিছু বড় বড় শহরে, এবং ছোট ও মাঝারি বেসরকারী কল-কারখানায়। প্রধানত এই কয়লার উপরই নির্ভরশীল ছিল এই অঞ্চলের মানুষের জীবিকা। পরিত্যক্ত তারা কয়লাখনি ছাড়া ছোট ছোট কুঁয়ো খুঁড়ে মাটির ৩০-৪০ ফুট নীচ থেকে আদিম পদ্ধতিতে কয়লা উৎপাদন চলত। আর আছে অল্প কিছু এক ফসলী জমি। কর্মক্ষম

মানুষের দেড় থেকে দুই শতাংশ মানুষ চাকুরীজীবি। বেঙ্গল এমটা আগমণের সাথে সাথে তারা ব্লক থেকে 'বেআইনী কয়লা' সংগ্রহ বন্ধ হল। খোলামুখ কয়লা খনির জন্য জমি চলে যাওয়ায় অল্প একটু চাষের সুযোগও হারিয়ে ফেলল।

বেঙ্গল এমটা কোল মাইনস্ কোম্পানি তৈরি হয় ১৯৯৭ সালে। কাগজে কলমে ভারত সরকারের খনি মন্ত্রক পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ ও পশ্চিমবঙ্গ পাওয়ার ডেভলপমেন্ট করপোরেশন কে তারা (পূর্ব) ও তারা (পশ্চিম) কয়লাব্লক দিয়ে দেয় ক্যাপটিভ খনি হিসাবে। ঐ ব্লকের কয়লা শুধু মাত্র উপরের দুটি সংস্থাই ব্যবহার করতে পারবে। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ ও পশ্চিমবঙ্গ পাওয়ার ডেভলপমেন্ট করপোরেশন লিমিটেড যৌথভাবে ইষ্টার্ণ মিনারেল এন্ড ট্রেডিং (এমটা) কোম্পানির সাথে কয়লা উত্তোলনের দায়িত্ব নিল। (এই যৌথ উদ্যোগটির নাম বেঙ্গল এমটা কোল মাইনস্ লিমিটেড।) এরমধ্যে ৭৪ শতাংশ ইকুইটি শেয়ার এমটা কোম্পানির (এই এমটা কোম্পানি প্রধানত ঠিকেদারিতে বিভিন্ন খনিজ উত্তোলনের কাজ করে।) চুক্তি মোতাবেক উত্তোলিত কয়লা শুধুমাত্রই WBSEB ও WBPDCL এর বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলো ব্যবহার করতে পারবে।

১৪ই মার্চ ১৯৯৭ এর চুক্তি অনুসারে এমটা কোম্পানি পুরো কয়লা উত্তোলন ও পরিবহণের দায়িত্ব পেল। এমনকি সমস্ত কয়লা খনির নিয়ন্ত্রণ ও নিরাপত্তা দেখত - এমটা কোম্পানি।

তারা খোলামুখ খনির সংক্ষিপ্ত কিছু বিবরণ নিচে দেওয়া হল।

১) মোট খননযোগ্য কয়লা ৩০.৬২ মেট্রিক টন।

২) বছরে মোট উৎপাদনের লক্ষ্য মাত্রা ২ মেট্রিক টন।

৩) উৎপাদন হয় ৮০০০টন প্রতি দিনে।

৪) একটন কয়লা পাওয়ার জন্য মাটির পাথর সরাতে হয় ৩.৯৬ টন।

৫) কয়লাখনিটির আয়ু ১৭ বছর

৬) কয়লার মান B বা C.

৭) মোট বিনিয়োগ ১০২৬৩.২১ লাখ টাকা।

৮) Menpower/ কর্মসংখ্যা ৮০০

৯) প্রতি লাখ পুঁজি বিনিয়োগে কর্মসংস্থান ১.০৮।

১০) মোট লিজ জমি ৮০০ হেক্টর।

১১) খনির কাজে ক্ষতিগ্রস্ত জমি পরিমাণ ৩৬১ হেক্টর।

১২) পরবর্তী দশ বছরে জমির প্রয়োজন ২০০ হেক্টর।

১৩) জমির হস্তান্তর ৮০ শতাংশ জমি সরকারের ভেষ্টেড জমি। বাকি ২০ শতাংশ ব্যক্তি মালিকের কাছ থেকে নিতে হবে।

১৪) জমির ক্ষতিপূরণের পরিমাণ ২ কোটি টাকা।

১৫) বন সৃজন করা হবে ১৫২ হেক্টর জমিতে।

১৬) যে গ্রামের জমি চলে গেছে চুরুলীয়া, লোধা, চিচুরবিল কয়লা খনির জন্য জমি যেতে পারে জয়নগর, দিশের মন, বাগুলী, মাধপুর এই সব গ্রামের।

১৭) উৎপাদন ব্যয় ৫২৫ টাকা টন প্রতি।

ভারী মাটি কাটার যন্ত্র শভেল ও ডাম্পারের সমন্বয়ে তারা খোলামুখ খনি থেকে কয়লা সংগ্রহ করা হয়, শভেল হল যন্ত্রচালিত বড় বেলচা জাতীয়। খোলা মুখ খনি থেকে উপরের মাটি

ও পাথরের স্তর প্রথমে সরিয়ে রাখা হয়। একে বলে ওভার বার্ডেন। এই ওভার বার্ডেন (OB) একদিকে জমা করে রাখা হয়। এই ওভার বার্ডেন দিয়ে খনির গর্ভ ভরে দেবার কথা। তারপর কয়লা ডাম্পারে ভর্তি হয়ে যায় রেলওয়ে সাইডিং-এ। এই সাইডিংটি অবস্থিত ভানোড়ায়। সেখানে কয়লা থেকে পাথর বাছাই হয়। তারপর কয়লা ওয়াগণে ভর্তি হয়ে চলে যায় বিভিন্ন তাপ উৎপাদন কেন্দ্রে।

ভারত সরকারের সাথে চুক্তি অনুসারে এই কয়লা শুধু মাত্র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ ও পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ উন্নয়ণের নিগম পাবে। কিন্তু এই কোম্পানীর কর্মীর কাছ থেকে জানা গেছে এই কয়লা বর্তমানে ডি পি এলও কিনছে। এবং কোল ইন্ডিয়া লিমিটেডের দামের থেকে প্রতি টনে ১৯ শতাংশ কমে কয়লা পেয়ে লাভের মুখ দেখেছে ডি. পি. এল. কোম্পানীর এনভায়ারমেন্টাল ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান দেখিয়েছে ১৪০ ফুট পর্যন্ত গভীরতার কয়লা তোলা হবে। খোলা মুখ পদ্ধতিতে। এরপর পাঁচ বছর বাদে তারা ব্লকের এক অংশ থেকেই আন্ডারগ্রাউন্ড খনি বা মাটির তলায় খনি করে উৎপাদন শুরু হবে। এখানে উল্লেখ্য কয়লা উৎপাদন শুরুর প্রায় সাত বছর পরেও মাটি তলার খনির কোন প্রসঙ্গ শোনা যায় নি।

<u>এরপর দেখা যাক তারা কয়লা খনির শ্রমিক ও কর্মীদের অবস্থা</u> এনভায়ারমেন্টাল ম্যানেজমেন্ট রিপোর্ট বলেছে মোট কর্মী সংখ্যা ৮০০। এদের মধ্যে প্রায় ২০ থেকে ২৫ শতাংশ সরাসরি বেঙ্গল এমটা কোল মাইনস্ লিমিটেডে চাকরি করে। সাধারণত এদের অফিসের কাজ, উৎপাদনের তদারকি, কয়লার পরিবহণের হিসাব রাখার কাজ। এদের মধ্যে ৫০-৬০ জন স্থানীয় মানুষ আছেন। দুই একরের বেশী জমি অধিগ্রহণের ক্ষতিপূরণ হিসাবে এরা চাকরি পেয়েছে। গ্রামবাসীদের বক্তব্য অনুসারে জমি হারানোর জন্য যত জনের চাকরি পাবার কথা ছিল ততজন চাকরি পায়নি। আর স্থানীয়দের মধ্যে মাত্র ৮-১০ জনের স্থায়ী চাকরী হয়েছে। আর বেশীর ভাগেরই মাইনে ২২০০ থেকে ২৫০০ এর মধ্যে। বেঙ্গল এমটার স্থায়ী কর্মীরা মাসে নির্দিষ্ট হারে বেতন পায়। এদের একটা অংশের পেনশন, গ্র্যাচুইটি বোনাস এমন কি চিকিৎসার সবরকম সুযোগ সুবিধা আছে। এরা মোটামুটি ৫০০০ টাকা বা তার উপরে বেতন পায়।

এমটা কোম্পানির অধীনে আছে প্রায় ৬০০ ঠিকা শ্রমিক। এদের চাকরীর কোন নিরাপত্তা নেই। এরা বেশীরভাগই আসানসোলের বাইরে থেকে, প্রধানত বিহার ও উত্তরপ্রদেশ থেকে আসা দক্ষ ও অদক্ষ শ্রমিক। গ্রামের কোন একজন চাকরি করে। তার যোগাযোগে অন্যরা চলে আসে কাজ করতে। কাজে যোগ দিয়ে প্রথম মাসের মজুরী পাওয়া পর্যন্ত তারা জানে না কত পাবে। এরা ভারী মাটি কাটার যন্ত্র চালক বা মেশিন অপারেটর। আর আছে মেশিন চালকের হেলপার ও কিছু খালাসী। এদের নির্দিষ্ট কোন বেতন কাঠামো নেই। তবে সিনিয়ারিটি হিসাবে মাইনে পায়। এই শ্রমিকরা থাকে খুবই অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে ওভার বার্ডেনের কোলে। সারাক্ষণই ডাম্পার চলাচলের বিকট আওয়াজ আর কালো ধূলোয় ভরে থাকে, চারিদিকে তাকালে কোথায় সবুজ গাছ নেই। অথচ পরিবেশ পরিচালন (এনভায়ারমেন্ট ম্যানেজমেন্ট) পরিকল্পনার রিপোর্ট অনুসারে ডাম্পার চলাচলের রাস্তার দুপাশে যথেষ্ট পরিমাণ গাছ লাগাবার কথা যাতে ধূলো ও আওয়াজ লোকবসতি অঞ্চলে কম

পৌঁছায়। শ্রমিক কোয়ার্টার বলতে তিন চার সারি গায়ে গায়ে লাগান এসবেসটসের খুপড়ি। ঘরে জানালা প্রায় নেই বললেই চলে। বাইরে উনুন জ্বালিয়ে রান্না করতে বাধ্য হয়। এরা কেউই খুব একটা স্বচ্ছন্দ বোধ করল না কথা বলতে। কিছুক্ষণ কথা বললে বোঝা যায় এরা আসলে অস্থায়ী কর্মী হওয়ায় চাকরী চলে যাবার ভয়ে কাঁটা হয়ে থাকে। নতুন শ্রমিকরা দিনে ৭০ টাকা মজুরীতে কাজ শুরু করে। তারপর সিনিয়ারিটি অনুসারে মজুরী বাড়ে। তবে এদের নির্দিষ্ট কোন বেতন কাঠামো নেই।

কন্‌সালটেটিভ জয়েন্ট কমিটি (ICC) ন্যাশানাল কোন ওয়েজ এগ্রিমেন্টের আওতায় আসার জন্য বেঙ্গল কোল মাইনস্ লিমিটেড ও ICMLকে ডেকেছিল। কিন্তু তারা যায় নি। ন্যাশানাল কোল ওয়েজ এগ্রিমেন্ট ভারতবর্ষের সমস্ত কয়লা শ্রমিকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবার কথা। এখানে প্রায়ই ছোট খাটো দুর্ঘটনা ঘটে থাকে, তবে গ্রামের মানুষের কাছ থেকে শোনা যায় কেউ কর্মরত অবস্থায় দুর্ঘটনায় মারা গেলে কর্তৃপক্ষ অনেক সময় সমস্ত প্রমাণ লোপাট করে দেবার চেষ্টা করে। কোম্পানি বা ঠিকাদারের কাছে ছাড়া অন্য কারও কাছে নিয়োগের প্রমাণ না থাকায় কাজটা সহজ হয়। আবার জানাজানি হলে অনেক সময় প্রভাবশালী কোন শক্তি ক্ষতিপূরণ আদায় করার জন্য যায়। দর দাম করে কিছু আদায়ও করে।

এছাড়া এমটার আছে কিছু উপঠিকাদার। এরা বেশীরভাগ তারা কোলিয়ারী থেকে ভানোড়া সাইডিং এ কয়লা পরিবহণের কাজ করে। প্রায় দেড়শো মতন গাড়ি চলে। তার ২০০ জন ড্রাইভার ও ২০০ জন হেলপার আছে। এরা ৩০০০ ও ১৫০০ টাকা করে মাসে পায়। এদের বারো ঘন্টা কাজ করতে হয়।

এছাড়াও আছে আর একদল শ্রমিক। এরা স্থানীয়। ভানোড়া সাইডিং-এ বাছাই - এর কাজে যুক্ত। সাধারণ ভাবে একটা কথা এই অঞ্চলে চালু আছে কিছু সাধারণ মানুষকে চাকরী দেবার জন্য কোম্পানি যন্ত্র দিয়ে না করে লোক দিয়ে পাথর বোঝাই করায়। কিন্তু এখনও পর্যন্ত ভারতবর্ষে কোথাও যন্ত্রের সাহায্যে পাথর বাছাই করা হয় না। আর এখানে প্রথমে সর্বক্ষণের শ্রমিক নিযুক্ত ছিল। তাতে ৫০০ থেকে ৬০০ জন স্থানীয় গ্রামের মানুষ নিযুক্ত। তারপর স্থানীয় মানুষ চাকরীর দাবীতে আন্দোলন নামায় কোম্পানী সবাইকে সন্তুষ্ট করার পন্থা নেয়। একদল শ্রমিক মেয়ে পুরুষ উভয়েই মাসের ২০ দিন ও অন্য দল মাসের বাকি দশ দিন করে কাজ করে। এতে করে কোম্পানীর কোন ক্ষতি বা লাভ হয় না। এই কাজের সময়সীমা মাত্র ১৭ থেকে ২০ বছর। এই সাইডিংএও শ্রমিকদের অস্বাস্থ্যকর অবস্থার মধ্যে কাজ করতে হয়। সারাক্ষণ বড় বড় মেশিন চলার ফলে প্রচন্ড ধুলো ওড়ে। হাতে গ্লাপস বা ধূলোর থেকে বাঁচার জন্য মুখের মাস্ক প্রভৃতি ব্যক্তিগত সুরক্ষার সরঞ্জাম কিছুই কর্তৃপক্ষ দেয় না। খাওয়ার জলের কোন ব্যবস্থা ছিল না প্রায় ১-১.৫ কিমি লম্বা সাইডিং -এ। শ্রমিক অসন্তোষ একটিমাত্র জলের কল দেওয়া হয়েছে। এখানে এক এক জন মুন্সির অধীনে ১০ থেকে ১২ জন করে কাজ করে। মুন্সির উপস্থিতিতে সবাই বলল প্রতি টন কয়লা বাছাই এর জন্য ১৪ টাকা করে পায়। একটি প্রায় ৫০ টনের রেক ভরার জন্য মুন্সি সই করে টাকা নেয় কোম্পানির কাছ থেকে। তারপর সে সমান ভাগ করে দেয় সবার মধ্যে। এটা কি কোম্পানীর আমলের পরিবার নিয়ে

দলবদ্ধভাবে কয়লাখনিতে কাজ করতে আসাকে মনে করিয়ে দেয় না?

এতক্ষণ আলোচিত স্বীকৃত, আধাস্বীকৃত শ্রমিক বর্গের বাইরেও আছে আর একদল মানুষ। যাদের পেট চলে বেঙ্গল এমটার অবহেলায় ছুঁড়ে দেওয়া ভুক্তাবশেষ উপরের স্তরের মাটি ও পাথরের সাথে ফেলে দেওয়া কয়লা থেকে। আশেপাশের গ্রামের মেয়ে, পুরুষ, বাচ্চা ভোর না হতে বেরিয়ে পড়ে কয়লা বাছার কাজে। চার পাঁচ তলা বাড়ির মত উঁচু পাহাড়ের থেকে সংগ্রহ করে ওভার বার্ডেনের মাটি ও পাথরের সাথে মিশে থাকা কয়লা। কেউ কেউ আবার বাড়ি থেকে খাবার বয়ে নিয়ে আসে। সাধারণত মেয়েরা তাদের সংগৃহিত কয়লা সাইকেলে বয়ে নিয়ে যারা কয়লা বিক্রি করে, চলতি নাম সাইকেলওয়ালাদের কাছে ঝোড়া হিসাবে কয়লা বিক্রি করে দেয়। আর সাইকেলওয়ালারা সাইকেলে করে কয়লা টানতে টানতে নিয়ে আসে আসানসোল শহরে। কেউ কেউ নির্দিষ্ট একজনের কাছেই পুরো কয়লা পাইকারী বিক্রি করে দেয়। সাইকেল টানতে হয় প্রায় ২৫ থেকে ৩৫ কিলোমিটার। আগে এরা পুলিশের হাত থেকে বাঁচতে প্রকাশ্য রাস্তা দিয়ে না গিয়ে মাঠের উপর দিয়ে গ্রামের ভিতর দিয়ে প্রাণান্তকর পরিশ্রম করে ঘুরে ঘুরে যেত। এরাই সেই বহু পরিচিত প্রেতপুরী থেকে রাতের অন্ধকারে চলতে থাকা কয়লা শ্রমিক। বেঙ্গল এমটা আসার আগে আশেপাশের গ্রামের এই মানুষরাই তারা কোলিয়ারীর ইনক্রাইন থেকে কয়লা তুলে আনত। এটাই ছিল একমাত্র রুটি রুজি। এখনও তার কিছু পরিবর্তন হয় নি। শুধুমাত্র মাটির তলায় না গিয়ে মাটির উপর থেকে কয়লা পাচ্ছে। আর পুলিশের জুলুম বাজি তোলা আদায় সবই আছে। আর আছে যে কোন মুহূর্তে পাহাড়ের মত জমা হওয়া মাটি পাথরের স্তূপ থেকে ধ্বস নেমে দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা। এখানে প্রায়শই দুর্ঘটনায় হাত পা ভেঙে যাবার কথা শোনা যায়। তাও ছেদ নেই এই ধরণের জীবিকার। শোনা যায় গোয়েঙ্কার পাশাপাশি বেঙ্গল এমটা এইভাবে কয়লা সংগ্রহকে মৌখিক স্বীকৃতি দিয়েছে।

কাদের জীবনের জন্যে এই জীবিকার ব্যবস্থা? এই অমানুষিক শ্রমের কতটুকু মূল্য পায় এই মানুষ গুলো। এই শ্রমের উৎপাদন মূল্যই বা কার স্বার্থে? একটু খেয়ে পড়ে বেঁচে থাকার লড়াই স্বাভাবিক ভাবেই এই প্রশ্ন গুলোর সম্মুখীন করে দেয়।

অসহায় প্রাকৃতিক সম্পদের সমৃদ্ধি থেকে বঞ্চিত, মানুষগুলো মাঝে মাঝেই ক্ষোভে ফেটে পড়ে। প্রথমে রাজনৈতিক দলের নেতারা আশ্বাস দিয়েছিল অনেক মানুষ এই কোম্পানীতে চাকরি পাবে এবং এই অঞ্চলের উন্নয়ন হবে। জমি দিয়ে দাও। তার বিনিময়ে চাকরি পাবে। নিয়মমত ২ একরের বেশী জমি চলে গিয়েছে এমন অনেকেই চাকরী পায় নি। যাতে শ্রমিকরা সংগঠিত হতে না পারে তার জন্য বাইরের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে শ্রমিক নিয়োগ করা হয়েছে। স্থানীয় অল্প কয়েক জনকে চাকরী আর সমস্ত দলের নেতাদের তুষ্ট করা হয়েছে। সাধারণ মানুষকে ডান্ডা দিয়েই ঠান্ডা করে রাখা হয়েছে। কখনও চোর অপবাদ দিয়ে, আবার কখনও বাইরের শ্রমিকদের সাথে ঝামেলা বাঁধিয়ে দিয়ে পুলিশী নিপীড়ন নামিয়ে আনছে। অনেক সময় স্থানীয় যুবকদের রাতে বাড়ির বাইরে পালিয়ে থাকতে হচ্ছিল। কি কারণ জিজ্ঞাসা করায় একজন যুবক বলে ওঠে "কাজ খুঁজি কাজ"। তবে কোম্পানির জন্য "আরও ২৫০০ থেকে ৩০০০

জন কিছু করে খাচ্ছে" — এও একধরণের প্রতিক্রিয়া মানুষের মধ্যে। আর এই ভাবে খাওয়ার ফল গত সাত বছরে কি হচ্ছে তার নমুনাও সহজেই চোখে পড়ে।

১) চুরুলিয়া গ্রামে ঢোকার মুখে প্রায় দু-তিন কিমি রাস্তা ও দুপাশের ক্ষেতের কেটে নেওয়া ধান গাছের গোড়ায় মোটা ধূলোর আস্তরণ পড়ে আছে। বড় বড় কয়লা বোঝাই ডাম্পার অহরহ চলে ঐ রাস্তা দিয়ে। মিনিটে দুটো ডাম্পার যায়। গ্রামের মানুষের হিসাবে সারাদিনে ১০০০টা ডাম্পার চলে ঐ রাস্তা দিয়ে। ঐ রাস্তার একদম লাগোয়া গ্রামের স্বাস্থ্য কেন্দ্রটি। তার প্রত্যেকটি চেয়ার, টেবিল, মেঝে কয়লার গুঁড়োয় ভর্তি। সেখানে টিকাকরণ হয় অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে। কোন রকমে কাপড় ঢাকা দিয়ে ইনফেকশন আটকানোর চেষ্টা করে। গাড়ি চলাচল নিয়ন্ত্রণের জন্য নেই কোন সাইনবোর্ড। এই ছয় সাত বছরে সমস্ত ধরণের অসুখ ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিস্, চামড়ার অসুখ, মাইগ্রেণ বেড়ে চলেছে। বেড়েছে মানসিক রোগির সংখ্যাও। এমনকি বাচ্চারা শ্বাসকষ্ট নিয়েই জন্মাচ্ছে।

২) কয়লা বোঝাই ডাম্পার চলাচল করে স্কুলে যাবার রাস্তা দিয়ে। তার ফলে বেশ কিছু দূর্ঘটনা ঘটেছে পথ চলতি ছাত্রছাত্রীদের। দূর্ঘটনার বিনিময়ে কর্তৃপক্ষ কিছু টাকা দিয়ে চুপ করিয়ে দেয় গ্রামবাসীদের। আর এই ক্ষতিপূরণ পাওয়াও কিছু লোক করে খাচ্ছের তালিকার পড়ে বলে, অনেকে মনে করে। একজন মহিলা ক্ষোভের সাথে বলে ওঠে "মানুষগুলো কি করবেক। কতকগুলা মেয়ে ছেলে বিয়াবেক আর ডাম্পারের তলায় পাচার করে দিবেক। টাকা পাবেক, আর কি করবে বল।" বাচ্চাদের একটু বকাবকি করলে বলছে ডাম্পারের তলায় চলে যাব।

৩) ব্লাষ্টিং এর ফলে ১০০ থেকে ২০০ মিটারের মধ্যে অবস্থিত বাড়িগুলো কেঁপে ওঠে, আর পাথর ছিটকে পড়ে। কয়েকটা বাড়িতে ফাটলও দেখা গেছে।

এই রকমই একটা ছবি এমটা কোম্পানি শ্রমিক ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের মানুষের। আসলে যে সম্পদের সুষ্ঠু ও পরিকল্পিত ব্যবহারে ঐ অঞ্চলের মানুষের জীবিকার সংস্থান হতে পারে, সেই সম্পদ লুঠ হয়ে যায় উপাধ্যায় গোয়েঙ্কাদের হাতে। মানুষের দারিদ্র্যকে কাজে লাগিয়ে যে কোন শর্তে কাজ করিয়ে নেওয়ার আদিম শোষণ চলে বেঙ্গল এমটা কোল কোম্পানীতে। কয়লা শিল্পে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর মালিক থেকে শুরু করে পরবর্তীকালে ভারতীয় সামন্ত মালিকদের অত্যাচার আর তার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ ও দীর্ঘ লড়াই-র ফসল ন্যাশানাল কোল ওয়েজ এগ্রিমেন্ট কে উপেক্ষা করে নয়া শিল্পনীতির যুগে, আজকের মালিক উপাধ্যায় গোয়েঙ্কারা শ্রমিকদের কাজ করায় চাবুক দিয়ে নয়, জোর করে ডিপোতে বেঁধে রেখে নয়, কর্মহীন নিরন্ন মানুষ দলে দলে যে কোন শর্তে কাজ করতে নিজেরাই চলে আসে। ক্ষোভ আছে, যন্ত্রণা আছে। কিন্তু উপায়? উপায়ান্তহীন কোম্পানীর খনির চারপাশে বসবাসকারী মানুষও। জমি গেছে, জীবনের নিরাপত্তা হারিয়েছে। এমনকি এরা স্থানীয় লোক ফলে সংগঠিত হতে পারে এই ভয়ে সম্ভবত এদের কোম্পানীর কাজে অবধি নেওয়া হয় না। আর এই সবই নাকি করা হচ্ছে দেশের স্বার্থে, উন্নয়নের স্বার্থে বিদ্যুৎ এর চাহিদা মেটাতে। খুব স্বাভাবিক প্রশ্ন, এ দেশ কার? উন্নয়ন কি? কার স্বার্থে? যে উন্নয়নের উল্টো পিঠ আসলে শ্রমিক শোষণ আর সাধারণ মানুষের নিরাপত্তাহীনতা।

Udyog, September, 2004

প্রতিবেদন

আসানসোল রাণীগঞ্জ কয়লাখনি শ্রমিকদের বর্তমান অবস্থার একটি চিত্র - উদ্যোগ প্রতিবেদন

কয়লা শিল্প জাতীয়করণের পরে কয়লাখনির শ্রমিকদের অধিকার আইনত কিছুটা সুরক্ষিত হয়েছে। মজুরীর হার বৃদ্ধি পেয়েছে। তা সত্ত্বেও প্রতিদিন ছয় থেকে আট ঘন্টা খনির ভিতরের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে কয়লাতোলার কাজে গুণগত কোন পরিবর্তন আসে নি। এখনও রয়েছে মুন্সি বা সর্দার। তারা কাজের বা হাজিরির ও পয়সার হিসাব রাখে লেখা পড়া না জানা পিস্‌রেটেড শ্রমিকদের. এরা প্রধানত কয়লা গাড়িতে বোঝাই করে বা লোডার। প্রতি টন কয়লা বোঝাই করার জন্য নির্দিষ্ট রেট বা পয়সা পায়। সপ্তাহ শেষে হাজরির টাকা পাওয়ার দিন ওত পেতে থাকে - সুদখোর মহাজন। দেখা যায় মহাজনের উপস্থিতিতে শ্রমিককে বেতন দেওয়া হচ্ছে মহাজনের সুদের টাকা কেটে নিয়ে। অনেকক্ষেত্রেই মাইনের বেশী অংশ চলে যায় মহাজনের সুদ মেটাতে। এই হতাশায় বেড়ে চলে অনুপস্থিতির হার। ২০০১ সালে অনুপস্থিতির হার প্রায় ৩৫ থেকে ৪০ শতাংশ পিস্‌রেটেড শ্রমিকদের। এছাড়াও প্রয়োজনমত মহিলা শ্রমিকদের দিয়ে অফিসারদের বাংলোয় রান্না থেকে শুরু করে দৈনন্দিন ঘরের কাজ করিয়ে নেওয়া হয়। এছাড়াও রয়েছে হাজরীর দুটনের বেশী উৎপাদনের জন্য অতিরিক্ত পয়সা না দেওয়া।

এমত অবস্থায় আইনত স্বীকৃত অধিকারগুলোও হারাতে বসেছে কয়লা শিল্পের শ্রমিকরা নতুন শিল্পনীতি রূপায়ণের ফলশ্রুতিতে। কয়লা শিল্প বেসরকারীকরণ ও কয়লাখনিকে ব্যক্তিগত মালিকানার হাতে তুলে দেবার প্রভাব পড়তে শুরু করেছে একদিকে কয়লাখনি শ্রমিকের উপর এবং কয়লা উৎপাদন প্রক্রিয়ায়। এখানে আলোচনা করা হল কয়লাখনির শ্রমিকদের উপর প্রভাব নিয়ে। একটি ক্ষেত্র হল ই সি এল যা সংগঠিত ক্ষেত্র বলে পরিচিত। দ্বিতীয়টি হল ব্যক্তিগত মালিকানার বা ঠিকেদারি প্রথায় যে সমস্ত কয়লাখনি গড়ে উঠছে সেখানে শ্রমিকদের অবস্থার স্বরূপ।

সংগঠিত ক্ষেত্র বা ই সি এল এ শ্রমিকদের অবস্থা ঃ

ই সি এল এর কর্মীর সংখ্যা ১৯৭৫ - ৭৬ থেকে ২০০২ - ২০০৩ পর্যন্ত কমেছে প্রায় ৬০ হাজার বা ৩৮ শতাংশ। নীচে সারণী - ১ এ শ্রমিক সংখ্যা ও স্বেচ্ছা অবসরের একটি চিত্র দেওয়া হল।

সারণী - ১

সাল	কর্মীর সংখ্যা	স্বেচ্ছা অবসর
১৯৭৫ - ১৯৭৬	১,৮৫,০৬১	–
১৯৯২ - ১৯৯৩	১,৭৩,৫৫০	–
১৯৯৭ - ১৯৯৮	১,৫৩,১৫৪	১,২৩১
১৯৯৮ - ১৯৯৯	১,৪২৭৪৬	৪,৮৮০
১৯৯৯ - ২০০০	১,৩৩,৩৬৩	৪,৪০৬
২০০০ - ২০০১	১,২৭,৪৫২	২,৪৯৬
২০০১ - ২০০২	১,১৯,৭১২	৪,১১১
২০০২ - ২০০৩	১,১৫,০০০	–

ন্যাশানাল কোল ওয়েজ এগ্রিমেন্ট VI - এর শ্রমিকদের জন্য বিভিন্ন সুযোগ সুবিধাকে লঙ্ঘন করা হচ্ছে নানা কায়দায়, নানা অজুহাতে।

(৯.৩.১ ধারা অনুসারে) চাকরীরত অবস্থায় কেউ মারা গেলে তার উপর নির্ভরশীল ব্যক্তি চাকরী পাবার কথা। কিন্তু ১৯৯৭ থেকে এই ক্ষেত্রে নিয়োগ প্রায় বন্ধ হবার পথে। প্রায় ৬০ শতাংশ ক্ষেত্রে নিয়োগ বাকি থেকে যাচ্ছে।

নিয়োগ বাকী থাকার ফলে ছেলেদের ৩৫ বছর ও মেয়েদেব ৪৫ বছর পেরিয়ে যাচ্ছে। এর ফলে তার ঐ ক্ষেত্রে নিয়োগ বাতিল হয়ে যাচ্ছে।

● (৯.৪.০) ধারা অনুসারে চাকরীরত অবস্থায় অসুস্থ হলে মেডিকেল বোর্ডে তাকে পাঠান হত। মেডিকেল বোর্ড তাকে কাজ করতে অক্ষম(আন্‌ফিট) ঘোষণা করলে, তার উপর নির্ভরশীল ব্যাক্তিকে চাকরী দেওয়া হত। কিন্তু এখন প্রায় এই ক্ষেত্রে নিয়োগ বন্ধ আছে। বেশীরভাগ ক্ষেত্রে শারীরিকভাবে অক্ষমদের স্বেচ্ছাঅবসর নিতে বাধ্য করাচ্ছে। আর কোন দুর্ঘটনাগ্রস্থ শ্রমিক তার নির্ধারিত কাজের জন্য অনুপযুক্ত হয়ে যাওয়া সত্বেও তাকে অন্য কাজে স্থানান্তরিত করা হয় না। ঐ দুটো কারণের জন্য অনুপস্থিতির হার বেড়ে যায়। আর স্বেচ্ছা অবসর নিয়ে নিতে বাধ্য হয়। (স্বেচ্ছা অবসর বেছে নেবার ক্ষেত্রে অনেকসময়ে ধার দেনা, মহাজনের ঋণ শোধ করার তাগিদ থাকে।

● নির্ভরশীল ব্যাক্তি মহিলা হলে এবং তার বয়স যদি ৪৫ বছরের কম হয়, সেক্ষেত্রে এ মহিলা চাকরি করতে না চাইলে তাকে ৩০০০ টাকা করে মাসিক ভাতা দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। মারা যাবার পরে তিন চার বছর লেগে যাচ্ছে ঐ টাকা বরাদ্দ হতে। কিন্তু তার জন্য ঐ কয় বছরের বকেয়া টাকা আর দেওয়া হচ্ছে না। এছাড়া অনেক ক্ষেত্রে মহিলাদের চাকরী না করতেই উৎসহিত করা হয়।

Dugar কমিটির রিপোর্ট অনুসারে মহিলাদের কোল ইণ্ডিয়াতে ৩০ টি জায়গায় নিয়োগ করার জন্য সুপারিশ করা হয়েছে। সেই অনুসারে ই সি এল এর ক্ষেত্রে ১০টি জায়গা বিভিন্ন ট্রেড-ইউনিয়নরা নির্দিষ্ট করে দিয়েছিল। তা সত্ত্বেও মহিলাদের নিয়োগ প্রায় বন্ধ।

● সম্পূর্ণ নির্ভরশীল ভাই ও জামাই এর ক্ষেত্রে নিয়োগ বন্ধ করে দিয়েছে।

● অনুপস্থিতির কারণে অনেক শ্রমিককে ছাঁটাই করে দিচ্ছে কাজে যোগদেবার প্রক্রিয়াকে দেরী করিয়ে দিয়ে।

● অবসর গ্রহণের পর পেনশন পেতে অনেক সময় লাগছে। কয়েক মাস পেনশন চালু করে, আবার কয়েকমাস বন্ধ করে রাখছে।

● ই সি এল কোয়ার্টার গুলোর অনেকদিন রক্ষনা-বেক্ষন হয় না। জলের সমস্যা ও খুব আছে।

● ই সি এল এর ক্যণ্টিন উঠে গেছে।

● এছাড়া আছে কয়লার গুঁড়ো থেকে হওয়া ফুসফুসের অসুখ - নিউমোকোনিউসিস্। একে কয়লাখনির শ্রমিকদের পেশাগত রোগ বলে। এটা নিরাময় যোগ্য নয়। এই রোগে একজন যতটা ক্ষতিগ্রস্থ হয় বা একজন নিউমোকোনিউসিস্ রোগী কতটা শারীরিক ভাবে অক্ষম হয়ে পড়ছেন তার উপর নির্ভর করে ক্ষতিপূরণ পায় ন্যাশানাল কোল ওয়েজ এগ্রিমেন্টের ধারা অনুসারে এই রোগ সঠিকভাবে নির্ণয় করা হচ্ছে কিনা নিজের দুটি তথ্য তুলনা করে। প্রথম তথ্যটি পাওয়া যায় পি এম ই বা পিরিওডিকাল মেডিকেল এক্‌জামিনেশনের রিপোর্ট থেকে। নিউমোকোনিউসিস্ নির্ণয় হওয়া শ্রমিক সংখ্যা সারণী -২ - তে দেওয়া হল।

সারণী - ২

সাল	সন্দেহভাজন রোগীর সংখ্যা	রোগ নির্ণয় হয়েছে
১৯৮৫ - ১৯৯০	১৪৩	৪৬
১৯৯০ - ১৯৯৫	১৫	৮
১৯৯৬ - ২০০০	৭৯	৩০

দ্বিতীয় তথ্য পাওয়া যায় রিজিনাল অকুপেশানাল হেলথ সেন্টারের (ইষ্ট) থেকে প্রকাশিত রিপোর্ট 'Study of Preumoeoniosis in UG Coal Mines in India' থেকে। ই সি এল এর শ্রমিকদের মধ্যে এক্সরে মেশিন নিয়ে গিয়ে সমীক্ষা চালায় ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অফ্ মেডিকেল রিসার্চ, ইন্টারন্যাশানাল ডেভলপ্যমেন্ট রিসার্চ সেন্টারের আর্থিক সহায়তায়। জুন ১৯৮৬ থেকে মার্চ ১৯৯০ পর্যন্ত সমীক্ষায় মাটির নিচের শ্রমিকদের মধ্যে

২.৮৪ শতাংশ ও মাটির উপরের শ্রমিকদের মধ্যে ২.১০ শতাংশের নিউমোকোনিউসিস ধরা পড়ে। (Categary 1/1) ধরা পড়ে। ২০০০ - ২০০১ এর শুধুমাত্র লোডারের সংখ্যা ৩২,৬৭৮। তাতে করে ২.৫ শতাংশ শ্রমিক হয় ৪০০ জনের বেশী।

ব্যক্তিগত মালিকানায় ও ঠিকাদারি প্রথায় চালু কারখানায় শ্রমিকের অবস্থা ।

এইভাবে সংগঠিত ক্ষেত্রে সামাজিক নিরাপত্তা কমিয়ে দেবার সাথে সাথে কয়লা শিল্পে তৈরী হচ্ছে আর একদল ঠিকে শ্রমিক – যাদের কোন নিয়োগপত্র নেই, চাকরীর নিরাপত্তা নেই, নেই কোন ইউনিয়ন করার অধিকার বা সংগঠিত হবার পরিপ্রেক্ষিত।

এই ধরণের শ্রমিক নিয়োগ হয় বর্তমানে আসানসোল, রাণীগঞ্জ কয়লাখনি অঞ্চলের তিনটে খোলামুখে কয়লাখনিতে।

১। বেঙ্গল এমটা কোম্পানী লিমিটেড - তারা খোলামুখ কয়লাখনি।

২। গোয়েঙ্কা বা সি ই এস সি এর ইন্‌টিগ্রেটেড কোল মাইনস্ প্রাইভেট লিমিটেড-এর (আই সি এম পি এল) এর সরষেতলি খোলামুখ খনি প্রকল্প। (সরষেতলি ভারতের প্রথম সম্পূর্ণ বেসরকারী কোলিয়ারী)।

৩। ই সি এল এর খয়েরবাঁধ খোলা মুখ খনি - যেখানে ই সি এর ঠিকাদারী প্রথায় কয়লা উৎপাদন করছে।

এই সব খনিতে প্রধানত হেভি আর্থ মুভিং মেশিন বা এইচ ই এম এম বলে পরিচিত মেশিনের সাহায্যেই উৎপাদন হয়ে থাকে। এইভাবে কয়লা উৎপাদনের শ্রমিক বেশীরভাগ মেশিন অপারেটর আর মেশিনের রক্ষনাবেক্ষনের কাজের সঙ্গে যুক্ত।

তারা খোলামুখ খনির শ্রমিক ঃ

এই কয়লাখনিতে কর্মরত শ্রমিকরা বেশীরভাগই দক্ষ শ্রমিক। এরা এসেছেন প্রধানত বিহার ও উত্তরপ্রদেশ থেকে। এরা দিনে ৭০ টাকা থেকে ১০০ টাকার মজুরির (সিনিয়ারিটি অনুসারে) ভিত্তিতে কাজে নিযুক্ত আছে। এদের মাইনের কোন রসিদ দেওয়া হয় না। চাকরী স্থায়ী নয়। যে কোন মুহূর্তে ছাঁটাই করে দেবার সম্ভবনা আছে। এখানে তিনটে সিফ্‌ট চলে। তবে শ্রমিকদের বক্তব্য ৪ ঘন্টা করে দুসিফট্‌ের লোকেদের দিয়ে ওভারটাইম করিয়ে নেওয়া হয়। তার জন্য অতিরিক্ত পয়সা দেওয়া হয় না।

শ্রমিক হিসাবে কোন প্রমাণপত্র না থাকার ফলে দুর্ঘটনায় মারা গেলে প্রমাণ লোপাট করে দেওয়া হয়।

যেহেতু এরা বাইরে থেকে আসা তাই ক্ষতি পূরণ ও পৌঁছয়না শ্রমিকদের বাড়িতে।

সাইডিং এ কয়লা বাছাই এর কাজে নিযুক্ত স্থানীয় গ্রামের শ্রমিক আশেপাশের গ্রাম থেকে শ্রমিক নিয়োগ করা হয়েছে ফুরণে কাজ করার জন্য। প্রত্যেক গ্রামের কয়েকজন মুন্সী আছে। তার অধীনে কাজ করে আরও ২০ থেকে ২২ জন শ্রমিক – যারা সরাসরি কয়লা বাছাই-এর কাজ করে। এক টন কয়লা বাছাইয়ের জন্য পায় ১৮

ই সি এল এ ঠিকেদারী (outsourcing)

ই সি এল ঠিকেদার দিয়ে কয়লা উৎপাদনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে আটটি প্যাচ বা (Patch) অঞ্চলে। এই প্যাচ-এ খোলা মুখ খনি করে কয়লা উৎপাদন করবে ঠিকেদার। ই সি এল প্রতি টন কয়লা উৎপাদন পিছু ধার্য দাম ঠিকেদারকে দেবে। আটটি প্যাচের মধ্যে পড়ছে খয়রাবাঁধ 'A', পাটমোহনা, শঙ্করপুর, বেলপাহাড়ী, এগরা, ডালুরবাঁধ, নারাকোণ্ডা 'B', সোনপুর বাজারী 'B$_1$"। তার মধ্যে পাঁচ টি ক্ষেত্রে কাজের অর্ডার হয়ে গেছে। এখানেও তৈরী হবে ঠিকেদার অধীনে একদল অস্থায়ী শ্রমিক। যাদের ক্ষেত্রে মানা হবে না ন্যাশনাল কোল ওয়েজ এগ্রিমেন্ট। এখানে উল্লেখ্য ই সি এল ৭৬ সাল থেকেই কিছু পরিমাণ উৎপাদ এইভাবে (outsourcing) করে করছে।

টাকা করে। এতে করে ১০ দিনের হিসাবে ৭০০ থেকে ৮০০ টাকা রোজগার করে।

এখানে কোন গ্রুপ বা কোন গ্রামের শ্রমিক ১০ দিন কাজ করে। আর অন্য গ্রুপ বা গ্রাম ২০ দিন কাজ করবে এই অলিখিত চুক্তির ভিত্তিতে কাজ হয়। ঐ সাইডিং-এ শ্রমিকদের অস্বাস্থ্যকর অবস্থার মধ্যে কাজ করতে হয়। সারাক্ষণ ডাম্পার রেকে কয়লা ভরে। তার ফলে প্রচণ্ড ধুলো হয় এ অঞ্চলে। নেই সেখানে যথেষ্ট জল স্প্রে করার ব্যবস্থা, যাতে বাতাসে ধুলোর পরিমাণ কমে। আর শ্রমিকদের মুখের মাস্ক ও হাতের গ্লাভস্ প্রভৃতি ব্যক্তিগত সুরক্ষার সরঞ্জামও দেন নি কর্তৃপক্ষ। খাওয়ার জলের কোন ব্যবস্থা ছিল না প্রায় ১ - ১.৫ কিমি লম্বা সাইডিং অঞ্চলে। শ্রমিক অসন্তোষে একটা মাত্র জলের কল দেওয়া হয়েছে। চুরুলীয়া গ্রামের টিউবারকিউলোসিস্ রোগির সংখ্যা বেড়ে চলেছে, চুরুলীয়াতেই অবস্থিত তারা কোলিয়ারী যার বয়স হল পাঁচ বছর।

সরষেতলি খোলমুখ খনি ঃ

বিভিন্ন কাজের জন্য বিভিন্ন ঠিকেদার নিয়োগ করেছে আই সি এম পি এল। তাদের অধীনে কাজ করে ঠিকে শ্রমিকরা। তারা মাসে ৭০০ থেকে ১০০০ বা ২০০০ টাকার বিনিময়ে No Work No Pay এর ভিত্তিতে নিযুক্ত।

ই সি এল এর খঁয়েরবাঁধ খোলামুখ খনি ঃ

এই খনিতে শুধুমাত্র উৎপাদন ও পরিবহনের কাজ হয় ঠিকেদার দিয়ে। সেই ঠিকেদারের অধীনে একই শর্তে নিযুক্ত দক্ষ ও অদক্ষ শ্রমিক।

ই এস আই (এমপ্লায়িজ স্টেট ইনস্যুরেন্স) অ্যাক্ট ১৯৪৮ অনুযায়ী যে সব শিল্পে ২০ জন শ্রমিক এবং বিদ্যুতের ব্যবহার হয় না বা ১০ জন শ্রমিক ও বিদ্যুতের ব্যবহার আছে - সেই শিল্পের শ্রমিকেরা ই এস আই স্কীমের আওতাভুক্ত হবে। এই স্কীমে শ্রমিকের স্বাস্থ্য পরিষেবা এবং অসুস্থতা, মাতৃত্ব, পেশাগত দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে আর্থিক ক্ষতিপূরণ পাবার কথা। কিন্তু বেঙ্গল এমটা তারা কোলিয়ারী ও সরষেতলী কোলিয়ারী অঞ্চলকে অন্তর্ভুক্ত করা না হওয়ার ফলে এইসব শ্রমিকরা ই এস আই স্কীমে প্রাপ্ত সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন।

এছাড়াও ই সি এল এর আটটি প্যাচ ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে দেওয়া দশটি অঞ্চলে সৃষ্টি হতে চলেছে চাকরীর নিরাপত্তাহীন, কম মজুরীর কয়লা খনি শ্রমিক। যাদের ক্ষেত্রে ন্যাশনাল কোল ওয়েজ এগ্রিমেন্টের কোন প্রাসঙ্গিকতাই থাকছে না।

তথ্যসূত্র ঃ অনিরুদ্ধ রায়

কয়লাশিল্পে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ঃ

শুধু ই সি এল নয়, পশ্চিমবঙ্গ সরকারও সরাসরি নেমে পড়েছে কয়ল সম্পদকে বেসরকারী হাতে তুলে দেবার কাজে। শুরু করতে চলেছে ঠিকেদারী, লিজ পদ্ধতিতে কয়লা উৎপাদন। পশ্চিমবঙ্গে কয়লা স্তরের সাতটি ব্লককে চিহ্নিত করেছে ওয়েষ্টবেঙ্গল মিনারেল ডেভলপমেন্ট এবং ট্রেডিং কর্পোরেশন কয়লা সম্পদ আহরণের জন্য। এই অঞ্চলগুলিতে যৌথ উদ্যোগ বা ঠিকেদারী প্রথায় বা সাবলিজ যেখানে যে পদ্ধতি কার্যকর হবে সেই পদ্ধতিতেই কয়লা উৎপাদন হবে। কোম্পানী তাদের বিভিন্ন সংস্থাকে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দিয়ে উৎপাদনে অংশ নেবার জন্য আবেদন করতে বলেছে। তার মধ্যে ই সি এল এর কিছু লিজ অঞ্চল আছে। এছাড়া বেশ কিছু ভার্জিন কয়লা ব্লক আছে বীরভূম ও বাঁকুড়ায়। এবং একটি সংরক্ষিত বনাঞ্চলের কয়লা স্তরের দিকেও নজর পড়েছে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের। এখানে তাপ উৎপাদন কেন্দ্রের জন্য শুধু ক্যাপটিভ খনি নয়। কয়েকটি নন ক্যাপটিভ খনি তৈরির প্রস্তাবও অছে।